পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

২ ডিসেম্বর ২০১২

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

২ ডিসেম্বর ২০১২

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ॥ ২ ডিসেম্বর ২০১২
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ২০১২ জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা

Parbatya Chattagram Chukti Bastabayan Prasange- 2 December 2012
published by Information and Publicity Department of Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) on 2 December 2012 from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Telefax: +880-351-61248, E-mail: pcjss.org@gmail.com, Web: www.pcjss-cht.org

Price : Tk. 50.00 only

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১-২
এক নজরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা	৩-৯
ক. সাধারণ	১০-১৩
▪ পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান	
▪ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনকরণের বিধান	
▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি	
▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কার্যকারিতা	
খ. পার্বত্য জেলা পরিষদ	১৩-২০
▪ অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ	
▪ সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান	
▪ স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন	
▪ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ	
▪ উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রম	
▪ পার্বত্য জেলা পুলিশ	
▪ ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জেলা পরিষদের এখতিয়ার	
▪ পরিষদের বিশেষ অধিকার	
▪ পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর	
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	২০-২২
▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন	
▪ ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ	
▪ অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ	
▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন	
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী	২২-৩৮
▪ উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন	
▪ আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন	
▪ ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান সংক্রান্ত	
▪ ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি	
▪ রাবার চাষের ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ	
▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ	
▪ কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান	
▪ উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকতা	
▪ জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান	
▪ সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার	
▪ জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন	
▪ সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার	
▪ সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ	
▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি	৩৯-৪৯

সম্পাদকীয়

দ্বিতীয় বারের মতো ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী শেখ হাসিনা সরকারের মেয়াদ প্রায় শেষ হওয়ার পথে। পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্যে ইতিমধ্যে চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকার দ্বিতীয় বার ক্ষমতাসীন হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু বিগত চার বছরের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন মৌলিক অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ সরকার তার নির্বাচনী ইসতেহারেও "পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে" মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করে। কিন্তু বিগত চার বছরে চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি বর্তমান সরকারের কেবল একের পর এক প্রতিশ্রুতি প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পক্ষ থেকে সময়সূচি ভিত্তিক পরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানানোর পরও বিগত চার বছরে সরকারের তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কার্যকর সামগ্রিক পরিকল্পনা ঘোষণা করেনি। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে এ বছরের প্রথম দিকে সরকারের কিছু উদ্যোগ জুম্ম জনগণসহ দেশবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিল। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বৈঠক এর মধ্যে অন্যতম ছিল। এছাড়া এ বছরের জানুয়ারি ও মে মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির পর পর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক আইন সংশোধনের জন্য ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, সর্বশেষ আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে (৩০ জুলাই ২০১২) আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এসব সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত সংশোধনী প্রস্তাব মোতাবেক উক্ত আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সর্বশেষ অহস্তান্তরিত বিষয়সমূহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের জন্য গত ১-৩ জুলাই ২০১২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৩০ আগস্ট ২০১২ এর মধ্যে অহস্তান্তরিত সকল বিষয় হস্তান্তরের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, এসব সভায় প্রচুর সময় ব্যয় করে একের পর এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সত্য, কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে এ বছরের প্রথম দিকে জুম্ম জনগণসহ দেশে-বিদেশে যে আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছে তাও বর্তমানে চরম ক্ষোভ ও সম্পূর্ণ হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, গত ৬ জুলাই ২০১২ রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত হেডম্যান সম্মেলন চলাকালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হেডম্যানদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কথা বলেছেন। উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সকলের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জুম্ম জনগণসহ পার্বত্যবাসী পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের স্বার্থেই বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে পার্বত্যবাসীর আন্তরিকতার কোন ঘাটতি আছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর আজ প্রায় ১৫ বছর এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে চার বছর ধরে জুম্ম জনগণসহ জনসংহতি সমিতি চরম ধৈর্য ধরে ঐকান্তিক সহযোগিতা দিয়ে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়সন সংক্রান্ত সরকারের সকল বৈঠকে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির অনুষ্ঠিত ৫টি সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা আন্তরিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেছেন এবং উদ্যোগ নিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। বিশেষত ১৬ জানুয়ারি ২০১২ প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎকারের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলোসহ পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিসদ আইন যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য লিখিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশমালা পেশ করেছিলেন। এ সরকারের আমলে পুনর্গঠিত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের অনুষ্ঠিত সকল সভায় (মোট তিন সভা অনুষ্ঠিত) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন। এর আগে চাকমা সার্কেল চীফ ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ও গত ২ মে ২০১১ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় সুপারিশমালাও প্রধানমন্ত্রীর নিকট জমা দিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে ও যথাযথভাবে পালনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি পার্বত্যবাসীর পক্ষে যা কিছু করণীয় সবকিছু যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছে। তাই এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়াদি বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ সরকারকেই নিতে হবে। বস্তুত: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক কালক্ষেপণ হয়েছে, আর কোনক্রমেই কাল বিলম্ব নয়। অন্যথায় পার্বত্য অঞ্চলের বিরাজমান অশান্ত পরিস্থিতি সার্বিক ক্ষেত্রে জটিলতর হয়ে উঠতে পারে যা কারোরই কাম্য হতে পারে না। সুতরাং সরকারের অভ্যন্তরে যারা নীতি-নির্ধারক এবং যারা সরকার তথা রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অবশিষ্ট মেয়াদের মধ্যে চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য সারাদেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ তথা স্থায়ী অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিশেষ আহ্বান জানাচ্ছে।

এক নজরে
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা

ক. ভূমিকা

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৫ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সেই রাজনৈতিক সমাধান এখনো অর্জিত হতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর ইতোমধ্যে চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এই সরকারের বিগত চার বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন মৌলিক অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

বর্তমান মহাজোট সরকারের প্রথম দিকে (২০০৯ সালে) সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে আহ্বায়ক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়োগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন পাহাড়ী সাংসদকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ, প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে দু'জন পাহাড়ি সাংসদকে নিয়োগ, কাপ্তাই ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারসহ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এসব পদক্ষেপের পর আর কোন কার্যকর অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

উল্লেখ্য, এ সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারাসমূহ সংশোধনের জন্য বিগত চার বছরে এক ডজনের অধিক একের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এখনো উক্ত আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধনার্থে সংসদে বিল উত্থাপিত হয়নি। অন্যদিকে অহস্তান্তরিত বিষয়গুলো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরের লক্ষ্যে গত ১-৩ জুলাই ২০১২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩০ আগস্ট ২০১২ এর মধ্যে অহস্তান্তরিত সকল বিষয় হস্তান্তরের জন্য উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক আজ অবধি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হস্তান্তর করা হয়নি। এ সরকারের আমলে হস্তান্তরিত বিষয়ের মোট ৭টি প্রতিষ্ঠান বা কর্ম হস্তান্তর করা হয়েছে, যদিও এসব প্রতিষ্ঠান/কর্মের মূল বিষয় অনেক আগেই তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে।

এমনিতর এক অবস্থায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বর্তমান মহাজোট সরকারের শেষ মেয়াদে এসে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে চুক্তি মোতাবেক ক্ষমতায়নের পরিবর্তে অথর্ব অবস্থায় রাখা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে পরিণত করা হয়েছে দুর্নীতির আখড়ায় আর ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থ সংরক্ষণের হাতিয়ার হিসেবে। সর্বোপরি পার্বত্য জেলা পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। চুক্তিতে বর্ণিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধানটি লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রতি পদে পদে। অব্যাহতভাবে সমতল অঞ্চল থেকে বহিরাগতরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকছে ও বসতি গড়ে তুলছে। তারা পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের জায়গা-জমি জবরদখল করছে। আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু জুম্মদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সকে অকার্যকর করে রাখা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর কোটি কোটি টাকা ক্ষমতাসীন

দল ও সদস্যদের স্বার্থ পূরণসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন নিয়ে বর্তমান সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরীতে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার দিয়ে স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগের বিষয়টি প্রতিটি ক্ষেত্রে লংঘন করে বহিরাগতদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-পূর্ব অবস্থার মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বক্ষেত্রে এখনো সেনা কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে। জুম্ম জনগণের উপর রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্যাতন-নিপীড়ন এখনো পূর্বের মতো অব্যাহত রয়েছে। অপারেশন উত্তরণের ছত্রছায়ায় ও সাধারণ প্রশাসনের সহায়তায় উগ্র সাম্প্রদায়িক জাতি বিদ্বেষী গোষ্ঠী জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল করার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সেনানিবাস সম্প্রসারণ, ইকো-পার্ক ও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনসহ উন্নয়নের নামে অস্থানীয় প্রভাবশালীদের নিকট ভূমি ইজারা প্রদান, সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Reserved Forest) ঘোষণা ইত্যাদির নামে জুমভূমিসহ জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জায়গা-জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে জুম্মদের উচ্ছেদের প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে। জুম্মদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট, নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর হামলা ও হত্যা, জুম্ম নারীদের অপহরণ, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার সর্বশেষ ঘটনা হচ্ছে ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটিতে জুম্মদের উপর প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে জাতিবিদ্বেষী, মৌলবাদী ও সেটেলার বাঙালিদের দ্বারা সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলা যেখানে এক শতাধিক জুম্ম আহত এবং জুম্মদের ঘরবাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সম্পত্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ নামধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অবাধে চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাস চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ত্রাসের পরিস্থিতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং জুম্ম জনগণকে অশান্ত ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির দিকে ক্রমাগত ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

খ. এক নজরে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অবস্থা

চুক্তির ধারা ও বিষয়	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
ক খন্ড : সাধারণ		
১ ধারা: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ	বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।	দাবী করা সত্ত্বেও সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা সন্নিবেশ করা হয়নি।
২ ধারা : সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করণ	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধন) প্রণীত হয়েছে।	চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ যেমন- বাংলাদেশ পুলিশ আইন, বন আইন, স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ইত্যাদি সংশোধন করা হয়নি।
৩ ধারা : পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি	কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে।	কমিটির নিজস্ব অফিস স্থাপন, জনবল নিয়োগ ও অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।

চুক্তির ধারা ও বিষয়	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
৪ ধারা: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কার্যকারিতা	চুক্তি বলবৎ রয়েছে। চুক্তির বিরুদ্ধে পৃথক দু'টি মামলায় ২০১০ সালে হাই কোর্টের রায় হয়েছে যা আপীল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে।	পার্বত্য চুক্তির আলোকে প্রণীত আইনসমূহ সংবিধানের ১নং তফসিলে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
খ খন্ড : পার্বত্য জেলা পরিষদ		
পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারা যথাযথভাবে সংশোধিত হয়নি। চেয়ারম্যান-গণের উপমন্ত্রীর মর্যাদা পুন:প্রদান করা হয়নি।	পরিষদসমূহের কার্যবিধিমালা এখনো যথাযথভাবে প্রণীত হয়নি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারা এখনো সংশোধিত হয়নি।
৩ ধারা: অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা সংজ্ঞা	"অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" এর সংজ্ঞা আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।	
৪(৫) ধারা: সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান	পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে উক্ত ধারা লঙ্ঘন করে ২১ ডিসেম্বর ২০০০ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত এক আদেশের মাধ্যমে ডেপুটি কমিশনারদের পাশাপাশি সার্কেল চীফেরও সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।	আইনকে লঙ্ঘন করে ডেপুটি কমিশনারদেরও সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেয়ার আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানানো সত্ত্বেও এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি।
৯ ধারা: স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন	কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।	এ বিধান লঙ্ঘন করে ভোটার তালিকায় বহিরাগতদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি।
১৩ ধারা: পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ	নিয়োগের ক্ষেত্রে পাহাড়িদের অগ্রাধিকার বজায় রাখার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।	আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বিধানটি যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। চরম দুর্নীতি ও দলীয়করণের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
১৯ ধারা: উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রম	উন্নয়ন সংক্রান্ত বিধান যথাযথভাবে আইনে সন্নিবেশ করা হয়নি।	সরকার এখনো উক্ত ধারা চুক্তি অনুসারে সংশোধন করেনি।

চুক্তির ধারা ও বিষয়	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
২৪ ধারা: পার্বত্য জেলা পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান	পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তৎনিম্ন স্তরের সদস্যদের নিয়োগের বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।	আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বিধানটি এখনো কার্যকর করা হয়নি।
৩৩(ক)(খ) ধারা: পার্বত্য জেলা পুলিশ	'পুলিশ (স্থানীয়)' বিষয়টি পরিষদের কার্যাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	বিষয়টি এখনো পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।
২৬ ধারা: পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর ও অধিগ্রহণে বাধা-নিষেধ	এ বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।	বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না।
৩৪(ক) ধারা: ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা	'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি পরিষদের কার্যাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' বিষয়টি এখনো হস্তান্তর করা হয়নি।
৩৪ ধারা: পরিষদের আওতাধীন বিষয় ও হস্তান্তর	৩৩টি বিষয়ের মধ্যে ১২টি বিষয় হস্তান্তরিত হয়েছে। এ সরকারের আমলে হস্তান্তরিত বিষয়ের ৭টি প্রতিষ্ঠান/কর্ম হস্তান্তরিত হয়েছে।	চুক্তির আগে ও পরে গুরুত্বপূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ কোন বিষয় হস্তান্তর করা হয়নি।
গ খন্ড : পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ		
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন ও পরিষদের অবকাঠামো	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে।	এখনো পরিষদের কার্যবিধিমালা প্রণীত হয়নি। ফলে আঞ্চলিক পরিষদ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ কমপ্লেক্স প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।
৯(ক) ধারা: পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়	এ বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।	আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার ক্ষমতা কার্যকর করা হচ্ছে না।
৯(খ) ধারা: পৌরসভা সহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়	এ বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	বিধানটি যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সাপেক্ষে পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ইত্যাদি স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য হবে মর্মে বিধান সংযোজনের প্রস্তাব কার্যকর করা হয়নি।

চুক্তির ধারা ও বিষয়	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
৯(গ) ধারা: সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান	এ বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	বিধানটি যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। তাই এখনো উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পুলিশ বিভাগ এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ডেপুটি কমিশনারগণ পূর্বের মতো আইন লঙ্ঘন করে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছে।
৯(ঘ) ধারা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবলী সমন্বয় সাধন	এ বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	এই বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি।
১০ ধারা: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান	এ বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	এই বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন অবজ্ঞা করে চলেছে। চুক্তি মোতাবেক উন্নয়ন বোর্ডের আইনটি সংশোধন করা হয়নি।
১১ ধারা: ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ	এ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।	১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির কার্যকারিতা বিষয়ে ২৯/১০/১৯৯০ জারীকৃত স্মারক বাতিল করে পার্বত্য চুক্তি সাপেক্ষে কার্যকর হবে মর্মে নতুন স্মারক জারী করা হয়নি।
১৩ ধারা: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন	এ বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	আইনের এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়নে সরকার আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করছে না।
ঘ খন্ড : পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী		
১ ধারা: উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন	১২,২২২ পাহাড়ি শরণার্থী পরিবার প্রত্যাবাসন করা হয়েছে।	৯,৭৮০ পরিবার তাদের জমি ফেরৎ পায়নি ও ৮৯০ পরিবার হালের গরুর টাকা পায়নি।
১ ও ২ ধারা: আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন	টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে। ২০০০ সালে দীপঙ্কর তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অবৈধ সভায় উদ্বাস্তুদের একটি বিতর্কিত তালিকা প্রণয়ন করা হয়। চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলারদেরও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে ১৯-০৭-১৯৯৮ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগ থেকে টাস্কফোর্সের কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়।	উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি। সেটেলারদের উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে বিশেষ কার্যাদি বিভাগ থেকে ১৯-০৭-১৯৯৮ দেয়া পত্র প্রত্যাহার করা হয়নি।

চুক্তির ধারা ও বিষয়	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
৩ ধারা: ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান	সরকার এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।	সরকার এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পক্ষান্তরে আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করাতে পরিস্থিতি জটিলতর হচ্ছে।
৪ ধারা: ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি	গত ১৮ জুলাই ২০১২ চেয়ারম্যান হিসেবে খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বর্তমানে চেয়ারম্যান পদ শূণ্য রয়েছে। চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ প্রণীত হয়েছে।	ভূমি কমিশন গঠিত হলেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু হয়নি। ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য একের পর এক সভা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এখনো উক্ত আইনটি সংশোধন করা হয়নি।
৮ ধারা: ভূমি ইজারা বাতিলকরণ	এ সরকারের আমলে বান্দরবান জেলায় ৫৯৩টি প্লট বাতিল করা হলেও অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অধিকাংশ প্লট পুনর্বহাল করা হয়।	প্রায় ২০০০ প্লটের প্রায় ৫০ হাজার একর জমির লীজ এখনো বাতিল করা হয়নি। নতুন করে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।
৯ ধারা: পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ	অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করে চলেছে।	বরাদ্দকৃত অর্থ দুর্নীতি ও দলীয়করণের কারণে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না।
১০ ধারা: কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান	সরকারী চাকুরীতে ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারী চাকুরীতে কোটা সংরক্ষিত থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না।
১১ ধারা: উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা	আঞ্চলিক পরিষদের কোন মতামত ছাড়াই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ প্রণীত হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে পাহাড়িদেরকে বাঙালি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।	জুম্মদের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা বজায় ও বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে জুম্মদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখা হয়েছে।
১৩ ধারা: জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্রজমাদান	জনসংহতি সমিতির ১৯৪৭ জন সদস্য কর্তৃক চার দফায় যথাযথভাবে গোলাবারুদ ও অস্ত্র জমা দেয়া হয়।	

চুক্তির ধারা ও বিষয়	বাস্তবায়নের অবস্থা	মন্তব্য
১৪ ধারা: সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার	সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ঘোষিত হয়েছে। ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হলেও এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি।	৭২০টি মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও আজ অবধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে গেজেট জারী করা হয়নি।
১৪ ধারা: জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন	সমিতির ১৯৬৭ জনের প্রত্যেককে এককালীন ৫০ হাজার করে অর্থ দেয়া হয়েছে। ৬৭২ জনকে পুলিশ কনষ্টেবল ও ১১ জনকে সার্জেন্ট পদে নিয়োগ এবং ৬৪ জনকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়েছে।	সমিতির সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প বরাদ্দ ও ৪ জন সদস্যের ২২,৭৮৩ টাকার ঋণ মওকুফ করা হয়নি।
১৭ ধারা: সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার	এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬৬টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে চুক্তির পর ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে একপ্রকার সেনাশাসন জারী করা হয়।	প্রায় চার শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প ও সেনা কর্তৃত্ব 'অপারেশন উত্তরণ' এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে।
১৮ ধারা: সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ	এ বিধান যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না।	এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব এখনো কার্যকর করা হয়নি।
১৯ ধারা: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইহার উপদেষ্টা কমিটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়েছে। উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়নি ও ইহা অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে।	Rules of Business অনুযায়ী মন্ত্রণালয় ইহার দায়িত্ব ও ক্ষমতা যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন

চুক্তির প্রস্তাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রস্তাবনা অংশে উল্লেখ আছে যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হলেন।

(ক) সাধারণ

পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান

চুক্তির ১নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বিধান অনুযায়ী জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সমুন্নত রাখা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য'কে ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে সেটেলার বাঙালিদের পুনর্বাসন; সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ; জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা; বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ; ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান; চাকুরী ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান; ভূমি বেদখল; বহিরাগতদের নিকট ভূমি বন্দোবস্তী ও ইজারা প্রদান; জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু করার লক্ষ্যে নতুন করে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটানো; তথাকথিত 'সমঅধিকার আন্দোলন' গঠনের মাধ্যমে সেটেলার বাঙালিদের সংগঠিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা, ভূমি জরিপের মাধ্যমে সেটেলার কর্তৃক জবরদখলকৃত ভূমি বৈধতা প্রদানের পাঁয়তারা ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলছে।

পূর্ববর্তী সরকারের মতো আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা অব্যাহত রয়েছে। গত ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাঙ্গামাটি শহরে মৌলবাদী শক্তির ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক আদিবাসী জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলায় শতাধিক জুম্ম ও ৯ জন বাঙালি আহত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয় ও বিশ্রামাগারে হামলাসহ জুম্মদের ঘরবাড়ী ও দোকানপাত ভাঙচুর করা হয়। অপরদিকে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় ও মানিকছড়ি উপজেলায় সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে জুম্মদের ১১০টি ঘরবাড়ী সম্পূর্ণভাবে ভস্মিভূত এবং ১৭ এপ্রিল ২০১১ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার বগাচদর এলাকায় হামলা চালিয়ে ২১টি ঘরবাড়ী ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং লুটপাট করা হয়।

এর পূর্বে ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০ দু'দিন ধরে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাটে জুম্মদের উপর সংঘটিত এক বর্বরোচিত হামলায় জুম্মদের ১২টি গ্রামের ২টি বৌদ্ধ মন্দির, ১টি গীর্জা, ২টি ব্রাক স্কুল, ২টি ইউনিসেফ পাড়া কেন্দ্র ও ৬টি পিডিসি অফিসসহ মোট ৪৩৪টি ঘরবাড়ী সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। হামলায় সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ২ জন জুম্ম আদিবাসী গ্রামবাসী নৃশংসভাবে খুন হয়। এছাড়া কমপক্ষে ২৫ জন জুম্ম আহত হয়। উক্ত বাঘাইহাট হামলার জের ধরে ২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি সদরে হামলা চালিয়ে জুম্মদের ৪টি গ্রামের ৬১টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং ৯টি বাড়ী ও দোকান লুটপাট করা হয়। এতে হামলাকারী একজন বাঙালি নিহত হয়। ঘটনার পর পরই পাহাড়ি-বাঙালি প্রায় ৬০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিম্নে সাম্প্রদায়িক হামলার তথ্যাবলী দেওয়া গেল-

সাম্প্রদায়িক হামলা	তারিখ	বাড়ীর সংখ্যা		নিহত	আহত	ধর্ষণ/ যৌন হয়রানি
		ভস্মীভূত	লুটপাট/ তছনছ			
বাঘাইহাট হামলা	৪ এপ্রিল ১৯৯৯	--	--	--	৫১	১
বাবুছড়া হামলা	১৬ অক্টোবর ১৯৯৯	-	৭৪	৩	১৪০*	১
বোয়ালখালী-মেরুং	১৮ মে ২০০১	৪২	১৯১	--	৫	--
রামগড় হামলা	২৫ জুন ২০০১	১২৬	১১৮	--	অসংখ্য	--
রাজভিলা হামলা	১০ অক্টোবর ২০০২	১১	১০০	--	৩	--
ভূয়াছড়া হামলা	১৯ এপ্রিল ২০০৩	৯	--	--	১২	--
মহালছড়ি হামলা	২৬ আগস্ট ২০০৩	৩৫৯	১৩৭	২	৫০	১০
মাইসছড়ি হামলা	৩ এপ্রিল ২০০৬	-	১০০	-	৫০	৪
সাজেক হামলা	২০ এপ্রিল ২০০৮	৭৮	৭৮	-	-	-
বাঘাইহাট হামলা	১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০	৪৩৭	-	২	২৫	-
খাগড়াছড়ি হামলা	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০	৬১	-	-	-	-
লংগদু হামলা	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১	২১	৬	-	-	-
রামগড়-মানিকছড়ি	১৭ এপ্রিল ২০১১	১১১	-	২	২৫	-
বাঘাইছড়ি-দীঘিনালা	১৪ ডিসেম্বর ২০১১	-	-	১	১০	-
রাঙ্গামাটি	২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২	-	১১	-	১১৭	-

* ৩ জন বৌদ্ধ ভিক্ষুসহ

অপরদিকে মায়ানমার থেকে আগত শত শত রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থী প্রশাসনের পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ সহায়তায় বান্দরবান জেলায় নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, আলিকদম ও সদর উপজেলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করছে। তারা ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র নিয়ে নানা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে চলেছে। সরকার পূর্বের মতো এবারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করে ২০০৭-০৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করেছে।

সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনকরণের বিধান

এই খন্ডের ২নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের বিধান করা হলেও এক্ষেত্রে সরকার কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২, ভোটার তালিকা বিধিমালা ১৯৮২, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০, খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১, এনজিওদের অনুসরণীয় কার্যপ্রণালীর পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ধারাসমূহ সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু সরকার খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১ ব্যতীত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, বন আইন, ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন ইত্যাদি আইনসমূহও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি। ফলে চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি

এই খন্ডের ৩নং ধারায় চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধিকে আহ্বায়ক এবং এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে সদস্য করে একটি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার বিধান অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) উক্ত কমিটি গঠিত হয়। এরপর চারদলীয় জোট সরকারের আমলে (২০০২-২০০৬) এবং ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে (২০০৭-২০০৮) উক্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ২৫ মে ২০০৯ সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগের মধ্য দিয়ে উক্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির স্বতন্ত্র কোন দপ্তর নেই, কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনে কোন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি এবং কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন তহবিল প্রদান করা হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠিত হওয়ার পর গত ১৯ আগস্ট ২০০৯ রাঙ্গামাটিতে, ২৬ অক্টোবর ২০০৯ ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনে, ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ খাগড়াছড়িতে, ২২ জানুয়ারি ২০১২ জাতীয় সংসদ ভবনে ও ২৮ মে ২০১২ জাতীয় সংসদ ভবনে মোট পাঁচবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ দুই সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনকল্পে ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং জাতীয় সংসদের তৎসময়ে চলমান বাজেট অধিবেশনে পাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২২ জানুয়ারি ২০১২ অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভায় সংশোধনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক যৌথভাবে চূড়ান্তকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয় এবং তা জাতীয় সংসদের তৎসময়ে চলমান শীতকালীন অধিবেশনে পাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকার কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ২৮ মে ২০১২ অনুষ্ঠিত ৫ম সভায় আবারও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনকল্পে ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং জাতীয় সংসদের তৎসময়ে চলমান বাজেট অধিবেশনে পাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তও কার্যকর করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কার্যকারিতা

এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হতে বলবৎ হবে এবং বলবৎ হওয়ার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে বদিউজ্জামান ও ২০০৭ সালে এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত পৃথক দু'টি মামলায় গত ১২-১৩ এপ্রিল ২০১০ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অসাংবিধানিক মর্মে অবৈধ বলা হয়েছে বলে যে রায় দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ এপ্রিল ২০১০ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত হাইকোর্টের রায়কে ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। পরবর্তীতে এই স্থগিতাদেশ নিয়মিত আপিল মামলা পর্যন্ত বর্ধিত হয়। সর্বশেষ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আপীল আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না পর্যন্ত হাইকোর্টের রায় স্থগিতাদেশ জারী করে। ইহা অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, উক্ত আপীল আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির নিমিত্তে সরকারের মধ্যে চরম উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বলাবাহুল্য, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে চুক্তির সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানের দাবী করা হয়েছিল। তখন সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাই তাদের পক্ষে সাংবিধানিক গ্যারান্টি বা স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হবে না। তবে ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তারা তা প্রদান করবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

গত ৩০ জুন ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দাবী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন-১৯৯৮ এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ (সংশোধন) সংবিধানের ১নং তফসিলে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কালে এ বিষয়ে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

(খ) পার্বত্য জেলা পরিষদ

চুক্তির এ খন্ডে বলা হয়েছে যে, উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়েছেন। এই বিধান মোতাবেক-

ক) ১৯৯৮ সালের ৩, ৪ ও ৫ মে যথাক্রমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাশ করা হয়। তবে জেলা পরিষদ আইনসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক অনেকগুলো বিষয় ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহ চুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে সংশোধিত হয়।

খ) পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮ নম্বর ধারা চুক্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে সংশোধন করা হয়।

গ) এই খণ্ডের ২নং ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে আর সে অনুযায়ী পরিষদকে পার্বত্য জেলা পরিষদ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। ক্ষমতাসীন দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়ে অন্তর্বর্তী জেলা পরিষদসমূহ অগণতান্ত্রিকভাবে বছরের পর বছর ধরে পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুত: এসব ৫-সদস্য বিশিষ্ট অন্তবর্তীকালীন পরিষদসমূহের জনগণের কাছে কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই।

ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কার্যবিধিমালা এখনো যথাযথভাবে প্রণীত হয়নি।

চ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মোট ৩৩টি বিষয়ের (যেখানে ৬৮টি কর্ম বিদ্যমান) মধ্যে মাত্র ১২টি বিভাগ ও কর্মের অংশবিশেষ পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে ১২ মে ২০০৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ২৯ ডিসেম্বর ২০১১ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হস্তান্তর করা হয়েছে। গত ১-৩ জুলাই ২০১২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী

ও প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ৩০ আগস্ট ২০১২ এর মধ্যে অহস্তান্তরিত সকল বিষয় হস্তান্তরের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৮ নভেম্বর ২০১২ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কৃষি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি কার্যালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের অধীন রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারি) এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীন সরকারি শিশু সদন হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশেষ করে জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), মাধ্যমিক শিক্ষা, বন ও পরিবেশ, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান, জুম চাষ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এখনো হস্তান্তর করা হয়নি।

ছ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহ যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা হয়নি। এছাড়া তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তিন চেয়ারম্যানগণের উপমন্ত্রীর মর্যাদা পুন:প্রদানের ব্যবস্থাও ঝুলিয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে নানাভাবে এসব আইনকে খর্ব করা হচ্ছে।

নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের বাস্তবায়নের অবস্থা উল্লেখ করা গেল-

অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ

এই খন্ডের ৩ নং ধারায় বলা আছে যে, "অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত: বসবাস করেন তাকে বুঝাবে।

১৯৯৮ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ প্রণয়ন কালে 'বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি' এর মধ্যে অবস্থিত 'এবং' শব্দটির পরিবর্তে 'বা' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়। প্রবল প্রতিবাদের মুখে অবশেষে ১৯৯৮ সালের ২৩ নং আইন দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক 'এবং' শব্দটি সন্নিবেশিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক মূলে প্রশাসনিক আদেশের ক্ষমতা বলে আইনটি লঙ্ঘন করে বৈধ জায়গা জমি না থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ বহিরাগতদেরকে অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে সনদপত্র প্রদান করে যাচ্ছেন এবং এর বদৌলতে অস্থায়ী বহিরাগতরা ভূমি বন্দোবস্তীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরী ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে যাচ্ছে।

সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান

এই খন্ডের ৪নং ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কেবলমাত্র তিন সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে না। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনকে লঙ্ঘন করে তিন সার্কেল চীফের পাশাপাশি তিন পার্বত্য ডেপুটি কমিশনারগণও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০০০ জারীকৃত এক প্রশাসনিক আদেশের পর থেকে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃকও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে যা বিধিসম্মত নহে। এছাড়া "চার্টার অফ ডিউটিজ অফ ডেপুটি কমিশনারস্" পরিপত্রে ডেপুটি কমিশনারের নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদানের বিধান থাকলেও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের কোন বিধান নেই।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য ডেপুটি কমিশনারগণ পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। উক্তরূপ সনদপত্র বিশেষতঃ চাকুরী, জমি বন্দোবস্তী বা কোটা ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ও অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দাগণ চাকুরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদি হতে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছে এবং অউপজাতীয় অস্থায়ী ব্যক্তিগণ স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে চাকুরীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে জায়গা-জমির মালিকানাস্বত্ব লাভ করে চলেছে।

স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন

এই খন্ডের ৯নং ধারা মোতাবেক কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা কার্যকর করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর বিগত ২০০০ ও ২০০৭-০৮ সালে প্রণীত ভোটার তালিকায় বাংলাদেশের সাধারণ ভোটার বিধিমালা অনুসারে বহিরাগতদেরও তালিকাভুক্ত করা হয়। অতি সম্প্রতি গত ১০ মার্চ ২০১২ থেকে শুরু হওয়া ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচী চলার সময়ও বহিরাগতদের ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়।

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮নং ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে সংশোধন (২০০০ সালের ৩৩, ৩৪ ও ৩৫নং আইন) করা হয়। প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আজ অবধি তা চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি। বিগত ২০০০ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ভোটার তালিকা বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দাবীর মুখে উক্ত বিধিমালা চূড়ান্তকরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আইন মন্ত্রণালয়ও ভেটিং প্রদান করে। এরপর আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে এক্ষেত্রে কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারও পূর্বের মতো ২০০৭-০৮ সালে প্রণীত তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীরা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়িসহ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, আলিকদম ও সদর উপজেলায় ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে। বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে গত ১০ মার্চ ২০১২ থেকে শুরু হওয়া ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময়ও প্রশাসনের সহায়তায় এসব উপজেলায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়।

পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ

এই খন্ডের ১৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলা পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসেবে থাকবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর করা হচ্ছে না।

এই খন্ডের ১৪ নং ধারার (ক) উপ-ধারায় বলা আছে যে, এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে বলে বিধান থাকবে। (খ) নং উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে। (গ) নং উপ-ধারায় আরো উল্লেখ আছে যে, এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে। এই ধারাসমূহ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না।

এ প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিরঙ্কুশভাবে অস্থানীয় ও অউপজাতীয়। তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী মনোভাবের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করে চলেছে।
বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে তিন পার্বত্য জেলায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি ও দলীয়করণের মাধ্যমে বহিরাগত লোকদের নিয়োগ দিয়ে চলেছে।

উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রম

এই খন্ডের ১৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে।

১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ প্রণয়নকালে এই ধারা যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উক্ত ধারা নিম্নোক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ

"(২ক) ধারা ২৩ (খ) এর অধীন সরকার কর্তৃক পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মের ব্যাপারে পরিষদ এই ধারার উপধারা (১) এর আওতায় নিজস্ব তহবিল হইতে বা সরকার প্রদত্ত অর্থ হইতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।"

"(৪) পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।"

উল্লেখিত বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য বিগত সরকারের নিকট বার বার দাবী করা হয়। অবশেষে ২০০০ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১নং আইন দ্বারা কেবলমাত্র প্রথমোক্ত (২ক) উপধারা চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত (৪) উপধারা সংশোধন করা হয়নি।

পার্বত্য জেলা পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলার সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান

এই খন্ডের ২৪নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত করা ও পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখার বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। এখনো পর্যন্ত উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য জেলা পুলিশবাহিনী নিয়োগ বা গঠিত হয়নি। অপরদিকে পূর্বের মতো পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুলিশবাহিনীর বদলী, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষমতা সরাসরি প্রয়োগ করা হয়ে আসছে।

অপরদিকে এই খন্ডের ৩৩(ক) ধারায় "পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান" এবং ৩৪(খ) ধারায় "পুলিশ (স্থানীয়)" পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের বিধান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ১৯৯৮ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনেও এই বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত বিষয়াদি এখনো জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ আইনগতভাবে তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এ সকল পরিষদসমূহকে উপেক্ষা করে অপারেশন উত্তরণের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছে। এখনো পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সভা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে আহ্বান না করে ডেপুটি কমিশনারদের মাধ্যমে আহ্বান করা হয়। গত ৭ অক্টোবর ২০১২ খাগড়াছড়ি সফরকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ব্যতীত তিন পার্বত্য জেলায় র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) এর একটি ইউনিট গঠন করা হবে মর্মে ঘোষণা দেন (আমাদের সময়, ৮ অক্টোবর ২০১২)। এভাবে সরকার স্বয়ং পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন লঙ্ঘন করে চলেছে। এর ফলে পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ে বিঘ্ন ঘটছে। ফলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা, চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উত্তরোত্তর অবনতি ঘটছে।

ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জেলা পরিষদের এখতিয়ার

এই খন্ডের ২৬নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর না করা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করার বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এই খন্ডের ৩৪(ক) ধারা মোতাবেক 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয়। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় ও ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদে যথাযথভাবে হস্তান্তর করা হয়নি। অপরদিকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসরণে ডেপুটি কমিশনারগণ নামজারী, অধিগ্রহণ, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। বনায়ন ও সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ এবং সেনা ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের নামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে রাবার প্লান্টেশন, বন বাগান, ফলবাগানসহ হর্টিকালচারের নামে বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির নিকট দীর্ঘমেয়াদী ভূমি লীজ দেওয়া হয়ে আসছে। লীজ গ্রহণকারীদের মধ্যে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও তাদের আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নানা প্রভাবশালী গোষ্ঠী রয়েছে। লীজ প্রদত্ত ভূমির মধ্যে রয়েছে আদিবাসী জুমচাষীদের প্রথাগত জুমভূমি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদলীয় ভূমিও রয়েছে। এর ফলে শত শত জুম্ম অধিবাসী তাদের জুম ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলছে এবং নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় সমতল জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ) অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১৬০৫টি রাবার প্লট ও হর্টিকালচার প্লট-এর বিপরীতে প্লটপ্রতি পঁচিশ একর করে ৪০,০৭৭ একর জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। নিম্নের সারণীতে তা দেখানো গেল-

ক্রঃ	উপজেলার নাম	রাবার প্লান্টেশন		হর্টিকালচার প্লট		মোট	
		প্লট সংখ্যা	জমি (একর)	প্লট সংখ্যা	জমি (একর)	প্লট সংখ্যা	জমি (একর)
১.	বান্দরবান সদর	৯১	২,২৭৫	১১৯	২,৮৫৫	২১০	৫,১৩০
২.	লামা	৮৩৫	২০,৮৭৫	১৭৭	৪,৫০০	১০১২	২৫,৩৭৫
৩.	আলিকদম	১৯৪	৪,৮৪৭	৬২	১,৫৫০	২৫৬	৬,৩৯৭
৪.	নাইক্ষ্যংছড়ি	১১২	২,৮০০	১৫	৩৭৫	১২৭	৩,১৭৫
মোট ৪টি উপজেলায়		১,২৩২	৩১,৭৯৭	৩৭৩	৯,২৮০	১,৬০৫	৪০,০৭৭

সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে হাজার হাজার একর জমি সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই অধিগ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী তথা সরকার পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে জুম্ম অধিবাসীরা নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং তাদের চিরায়ত জুম ভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। নিম্নে কেবলমাত্র বান্দরবান জেলার তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো-

ক্রঃ	বিবরণ	জমি (একর)
১.	সুয়ালকে গোলন্দাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণকৃত	১১,৪৪৫.৪৫
২.	সুয়ালক গোলন্দাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রক্রিয়াধীন	১৯,০০০.০০
৩.	রুমা সেনানিবাস সম্প্রসারণ	৯,৫৬০.০০
৪.	বান্দরবানে ব্রিগেড সদর দপ্তর সম্প্রসারণ চুড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন	১৮১.০০
৫.	টংকাবতিতে ইকোপার্ক ও সেনাবাহিনীর পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন	৫,৫০০.০০
৬.	বান্দরবান-লামা বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রক্রিয়াধীন	২৬,০০০.০০
৭.	বিজিবি ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার (রুমা উপজেলাধীন পলি মৌজা)	২৫.০০
	মোট জমির পরিমাণ	৭১,৭১১.৪৫

রুমা সেনানিবাসের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের অংশ হিসেবে প্রস্তাবিত জায়গা-জমি থেকে ম্রো অধিবাসীসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের জোরপূর্বক উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে। অপরদিকে রুমা উপজেলায় পলি মৌজাধীন থানা পাড়ায় বিজিবি ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য ২৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। এই হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হলে থানা পাড়ায় ৪০ পরিবার, বড়শি পাড়ায় ১৫ পরিবার এবং উপর ও নীচের রুমাচর পাড়ায় ৫০ পরিবার মারমা উচ্ছেদ হয়ে পড়বে।
খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন পলাশপুর বিজিবি ক্যাম্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১০০ একরের অধিক জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
সরকার একতরফাভাবে বনায়নের নামে ২,১৮,০০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় রয়েছে ৭২,০০০ একর জমি। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সংখ্যালঘু ও সুযোগ বঞ্চিত খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশপরম্পরায় জুমচাষ ও বসতি করে আসা জমিতে পরবাসী হয়ে পড়েছে। নিম্নে কেবলমাত্র বান্দরবান জেলার তথ্যচিত্র তুলে ধরা হল-

ক্রঃ	উপজেলা	মৌজার সংখ্যা	জমি (একর)
১.	আলিকদম উপজেলা	৩টি	৫,৭৫৪.৯৮
২.	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৩টি	৪,৮৪০.০০
৩.	লামা উপজেলা	৫টি	২,৭৮০.৯৯
৪.	বান্দরবান সদর উপজেলা	৫টি	১৫,৭৫০.০০
৫.	রোয়াংছড়ি উপজেলা	১০টি	৪৫,৯৫০.০০
৬.	রুমা উপজেলা	৫টি	১১,৫০০.০০
৭.	থানছি উপজেলা	৪টি	৭,৫০০.০০
মোট ৭টি উপজেলায় ৩৫টি মৌজায় জমির পরিমাণ			৯৪,০৬৬.৯৭
প্রজ্ঞাপন বহির্ভূত কিন্তু বন বিভাগের দখলে রয়েছে জমির পরিমাণ			২৩,৯৩৩.০৩
মোট বন বিভাগের আওতায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জন্য দখলকৃত জমি			১,১৮,০০০.০০

পরিষদের বিশেষ অধিকার

এই খন্ডের ২৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাবে। অধিকন্তু ২৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করার বিশেষ অধিকার থাকবে। ৩২নং ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

এই ধারাসমূহ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আইনের এই ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করা থেকে সরকার বিরত রয়েছে।

পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে এযাবৎ নিম্নোক্ত ১২টি বিষয়/প্রতিষ্ঠানসমূহ হস্তান্তর করা হয়-

১। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ
(ক) হর্টিকালচার সেন্টার
(খ) বিএডিসি
(গ) তুলা উন্নয়ন বোর্ড
২। স্বাস্থ্য বিভাগ-
(ক) পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ
(খ) পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
(গ) রাঙ্গামাটি নার্সিং ইনস্টিটিউট
(ঘ) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৩। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ
৪। শিল্প ও বাণিজ্য-
(ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
(খ) বাজারফান্ড প্রশাসন
(গ) টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট
৫। সমবায় বিভাগ
৬। সমাজসেবা বিভাগ
(ক) সরকারী শিশু সদন
৭। মৎস্য বিভাগ
(ক) রামগড় মৎস্য খামার
৮। প্রাণী সম্পদ বিভাগ
৯। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১০। সংস্কৃতি-
(ক) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত)
(খ) শিল্পকলা একাডেমী
(গ) পাবলিক লাইব্রেরী
১১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২। ক্রীড়া বিভাগ-
(ক) জেলা ক্রীড়া সংস্থা

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিভাগসমূহের কেবলমাত্র জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্ম ও বেতন-ভাতাদি জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী এখনো হস্তান্তর করা হয়নি। এছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে বাজারফান্ড প্রশাসন ও বিসিক এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কেবল কর্ম ও বেতন-ভাতাদি হস্তান্তর করা হয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বস্তুতঃ এখনো সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে ১২ মে ২০০৯ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ২৯ ডিসেম্বর ২০১১ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হস্তান্তর করা হয়েছে। ৮ নভেম্বর ২০১২ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কৃষি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি কার্যালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের অধীন রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারি) এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীন সরকারি শিশু সদন হস্তান্তর করা হয়েছে।

এছাড়া গত ১-৩ জুলাই ২০১২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ৩০ আগস্ট ২০১২ এর মধ্যে অহস্তান্তরিত সকল বিষয় হস্তান্তরের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক আজ অবধি কোন বিষয় হস্তান্তর হয়নি বা কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অপরদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্র ও উৎসাদির উপর কর, রেইট, টোল এবং ফিস আরোপের ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ইহা কার্যকর করার ক্ষমতা পরিষদসমূহকে দেওয়া হয়নি। দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে গঠিত অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদ বলবৎ থাকার কারণে জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়া গড়ে উঠতে পারেনি। ফলতঃ জেলা পরিষদসমূহ জেলার সার্বিক উন্নয়নে তেমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির এই খন্ডের ১নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। এই ধারা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত বাস্তবায়িত বিষয়সমূহ-

১। ১৯৯৮ সালের ৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হয়েছে।

২। ১৯৯৯ সালের ১২ মে অন্তর্বর্তীকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ২৭ মে অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের যাত্রা শুরু হয়।

৩। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার ফলে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হলেও সরকার এখনো পরিষদের কার্যবিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম ঝুলিয়ে রেখেছে। তাই আইন অনুসারে এ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী এখনো যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি।

৫। "পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রধান কার্যালয়, বাসভবন ও এতদসংশ্লিষ্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক" প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অবকাঠামো গড়ে উঠেনি।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ইহার উপর অর্পিত কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও সম্পাদন করতে পারছে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ২২(ক) ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের বিধান থাকলেও পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার ক্ষমতা কার্যকর করা হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্পিত দায়িত্ব পালন করার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন অবজ্ঞা করে চলেছে। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ সংশোধন করা হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ২২(ঘ) ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ২২(ছ) ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওসমূহের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি।

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ

এই খন্ডের ১১নং ধারায় বর্ণিত আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের অসংগতি দুরীকরণ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির কার্যকারিতা বিষয়ে ২৯/১০/১৯৯০ জারীকৃত স্মারক বাতিল করে চুক্তির আওতায় প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক আইন ১৯৯৮ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধন)সহ অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যকর হবে মর্মে নতুন স্মারক জারী করার প্রস্তাব করা হলেও সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ

এই খন্ডের ১২নং ধারা মোতাবেক পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ১৯৯৯ সনের মে মাসে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিধি প্রবিধান প্রণীত না হওয়ার কারণে পরিষদ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে।

অপরদিকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার ফলে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন

এই খন্ডের ১৩নং ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ করে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করার বিধান পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনের এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এছাড়া পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও পাহাড়ি জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট সুপারিশ করা হলেও সরকার কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

এনজিওদের অনুসরণীয় কার্যপ্রণালীবিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধানাবলী সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পেশ করা হলেও সরকার আজ অবধি কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা ১৯৭৩, শিক্ষা নীতিমালা এবং পানি সম্পদ আইন ২০০৯ এর উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকার যথাযথ কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ২০১০ সালে শুরু হওয়া বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী আইন প্রণয়ন এবং বন আইন সংশোধনের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক পরিষদের কোন মতামত নেয়া হয়নি। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮, স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ ও বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ২০১২ প্রণয়নের সময় সরকারের তরফ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কোন মতামত নেয়া হয়নি। তবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নের সময় আঞ্চলিক পরিষদের কতিপয় প্রস্তাব শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়নের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কোন মতামত নেয়া হয়নি।

(ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ এই খন্ডে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ে একমত হয়েছেন। এই খন্ডে বর্ণিত বিষয়াবলী বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা একনজরে নিম্নরূপ-

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাদের অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি বাস্তবায়ন হলেও অধিকাংশ জুম্ম শরণার্থীর জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি।

২। আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) টাস্কফোর্সের তৎকালীন চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদারের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করা হয়। কিন্তু আজ অবধি তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালিদেরও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে চরম জটিলতা সৃষ্টি হয়ে আছে।

৩। ভূমিহীন জুম্মদেরকে ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান করা হয়নি।

৪। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে আজ অবধি পর পর চারজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়োগ দিয়েছে। গত ১৮ জুলাই ২০১২ সর্বশেষ চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বর্তমানে চেয়ারম্যান পদ শূণ্য রয়েছে।

৫। তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" প্রণীত হয়। কিন্তু উক্ত আইনে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয় যা পরবর্তীতে যাচাইবাছাই পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত করে ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে উত্থাপনের জন্য বিল আকারে গত ২০ জুন ২০১১ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৬। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির ৪র্থ ও ৫ম সভায় এবং আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় উক্ত ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু উল্লেখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আজও আইনটি সংশোধন করা হয়নি। তাই ভূমি কমিশন অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে।

৭। রাবার চাষ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে অস্থানীয়দের নিকট বরাদ্দকৃত ভূমি ইজারা এখনো সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়নি। ২০০৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বান্দরবান জেলায় ৫৯৩টি প্লট বাতিল করার সিদ্ধান্ত হলেও পরবর্তীতে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে উক্ত বাতিলকৃত প্লটগুলো অধিকাংশই পুনর্বহাল করা হয়। পক্ষান্তরে চুক্তির পরও ডেপুটি কমিশনারগণ অবৈধভাবে ইজারা প্রদান করে চলেছেন।

৮। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেছে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। প্রত্যেকটি সরকার আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে আসছে। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের গৃহীত বাজেট অনুসারে সরকার অর্থ বরাদ্দ করে না।

৯। পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য যথাযথ বৃত্তির ব্যবস্থা নেই।

১০। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পৃষ্টপোষকতার ক্ষেত্রে তেমন কোন পদক্ষেপ নেই।

১১। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের যথাযথভাবে গোলাবারুদ ও অস্ত্র জমাদান সম্পন্ন হয়েছে।

১২। জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদের সাধারণ ক্ষমা করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলাগুলোর মধ্যে জেলা মামলা প্রত্যাহার কমিটি কর্তৃক ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে; কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত অনুসারে আজ অবধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মামলা প্রত্যাহারের গেজেট প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া সাজাপ্রাপ্ত মামলা ও সামরিক আদালতের মামলাগুলিও অপ্রত্যাহৃত অবস্থায় রয়ে গেছে।

১৩। সরকার কর্তৃক জনসংহতি সমিতির ১৯৬৭ জন সদস্যকে জনপ্রতি এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ৬৪ জন সদস্যকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করেছে। ৬৮৫ জনকে পুলিশবাহিনীতে ভর্তি করেছে। কিন্তু অপরাপর সদস্যদেরকে এখনো পর্যন্ত তাদের ঋণ মওকুফ ও দাখিলকৃত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।

১৪। পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের দলিলপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়েছে। কিন্তু সরকার পক্ষ দাবী করছে এযাবৎ ২০০টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কোন ক্যাম্প প্রত্যাহৃত হয়েছে তার কোন দলিলপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়নি। অপরদিকে ২০০১ সালে 'অপারেশন দাবানল'-এর পরিবর্তে 'অপারেশন উত্তরণ' জারী করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাশাসন বলবৎ এবং সেনা ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে একটি ব্রিগেডসহ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাহারের কোন দলিলপত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নিকট প্রেরণ করা হয়নি। তবে প্রত্যাহৃত কতিপয় ক্যাম্পে আবার এপিবিএন মোতায়েন করা হয়েছে।

১৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনো বহিরাগতরা কর্মরত রয়েছে।

১৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছে এবং ১৫ জুলাই ১৯৯৮ মন্ত্রণালয়ের Rules of Business-এর প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বরাবরই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।

চুক্তির 'ঘ' খন্ডে বর্ণিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন

এই খন্ডের ১নং ধারা অনুযায়ী এবং সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে জুম্ম শরণার্থীরা প্রত্যাবর্তন করে। টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে প্রত্যাগত শরণার্থীদের অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি। তাদের জায়গা জমি ও গ্রাম এখনো সেটেলারদের দখলে থাকায় তাদের পুনর্বাসন এখনো যথাযথভাবে হতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

মোট প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী সংখ্যা (৬৪,৬০৯ জন)	১২,২২২ পরিবার
ধান্যজমি, বাগান-বাগিচা ও বাস্তুভিটা ফেরৎ পায়নি	৯,৭৮০ পরিবার
প্রত্যাগত শরণার্থীদের মধ্যে হালের গরুর টাকা পায়নি	৮৯০ পরিবার
স্থানান্তরিত বিদ্যালয় পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি	৬টি বিদ্যালয়
স্থানান্তারিত বাজার পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি ও শরণার্থীদের জমিতে নতুন বাজার স্থাপন করা হয়েছে	৫টি বাজার
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির	৭টি মন্দির
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত শরণার্থীদের গ্রাম	৪০টি
ঋণ মওকুফ করা হয়নি এমন শরণার্থীর সংখ্যা	৬৪২ জনের অধিক

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালে দীঘিনালার ট্রানজিট ক্যাম্পে (আবাসিক বিদ্যালয়) অবস্থানরত ২৬ পরিবার জুম্ম শরণার্থী, যাদের জমির উপর বোয়ালখালী বাজার স্থাপনের ফলে এখনো নিজেদের বসতভিটায় বসতি করতে পারেনি, তাদেরকে ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হয়। তারা এতদিন নিজেদের জমি ও বসতভিটা ফেরত পাওয়ার দাবী করে আসছিল।

চারদলীয় জোট সরকার ২০০৩ সালে জুম্ম শরণার্থীদের রেশন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে জুম্ম শরণার্থীদের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখে ১৩ অক্টোবর ২০০৩ সরকার শরণার্থীদের রেশন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু মাঝখানে এক বছর ধরে মাত্র অর্ধেক রেশন দেয়। এক বছরের উক্ত বকেয়া অর্ধেক রেশন আজও শরণার্থীরা পায়নি। বর্তমানে জুম্ম শরণার্থীদের পূর্বের ন্যায় রেশন দেওয়া হচ্ছে।

আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

এই খন্ডের ১ ও ২নং ধারা মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান থাকলেও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি। পূর্বের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) দীপঙ্কর তালুকদারকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। চুক্তিতে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা বুঝানো হয়ে থাকলেও সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বসতিদানকারী সেটেলার বাঙালিদেরকেও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী এই উদ্যোগের প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় টাস্কফোর্সের নবম সভা চলাকালে ওয়াকআউট করেন। পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে দীপঙ্কর তালুকদারের সভাপতিত্বে ১৫ মে ২০০০ অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের অবৈধ একাদশ সভায় একতরফাভাবে ৯০,২০৮ উপজাতীয় পরিবার এবং ৩৮,১৫৬ অউপজাতীয় সেটেলার পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অবশেষে পার্বত্যবাসীর প্রবল প্রতিবাদের মুখে তৎকালীন টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

১৯ জুলাই ১৯৯৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগ থেকে সেটেলার বাঙালিদেরকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য যে পত্র টাস্ক ফোর্সকে দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাহারের জন্য গত ২৪ অক্টোবর ২০১০ জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আজ অবধি এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

১৫ মে ২০০০ তারিখের টাস্কফোর্সের অবৈধ একাদশ সভায় একতরফাভাবে পরিচিহ্নিত আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংখ্যা ও ঘোষিত প্যাকেজ সুবিধাদি নিম্নরূপ ঃ

জেলা	উপজাতীয় পরিবার	অউপজাতীয় পরিবার	সর্বমোট পরিবার
রাঙ্গামাটি	৩৫,৫৯৫	১৫,৫৯৫	৫১,১১১
বান্দরবান	৮,০৪৩	২৬৯	৮,৩১২
খাগড়াছড়ি	৪৬,৫৭০	২২,৩৭১	৬৮,৯৪১
সর্বমোট	৯০,২০৮	৩৮,১৫৬	১,২৮,৩১৪

প্যাকেজ সুবিধা ঃ

১) প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে এককালীন অনুদান বাবদ ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

২) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে অস্ত্রবিরতির পূর্বদিন পর্যন্ত (১০-৮-৯২) যে সকল উদ্বাস্তু পরিবারের -

(ক) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ রয়েছে তা সুদসহ মওকুফ করা যেতে পারে।

(খ) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার উপরের ঋণসমূহের কেবলমাত্র সুদ মওকুফ করা যেতে পারে।

৩) উদ্বাস্তুদের নিজ মালিকানাধীন জমি সংক্রান্ত বিরোধ ভূমি কমিশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

৪) আয়বর্ধন কর্মসূচীর জন্য একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত বরাদ্দ হতে তফসীল ব্যাংকের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, এর আগে ২০০০ সালের জুন মাসে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়কের নিকট স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলার সমস্যা নিরসন বিষয়ে নিম্নোক্ত দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয়-

১. (ক) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদেরকে আভ্যন্তরীণ অউপজাতীয় উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাতিল করা। এতদুদ্দেশ্যে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ হতে টাস্ক ফোর্সের নিকট প্রেরিত ১৯-৭-৯৮ তারিখের আদেশপত্রের অউপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়টি প্রত্যাহার করা।

(খ) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে স্থানান্তর ও পুনর্বাসন করা এবং উক্ত প্রক্রিয়া শুরু করা।

২. (ক) আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

(খ) বিভিন্ন থানায় বাদ পড়ে যাওয়া আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুত করা।

৩. টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪টি প্যাকেজ সুবিধার পরিবর্তে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক পেশকৃত সুযোগ-সুবিধাদির ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত প্যাকেজ সুবিধা অত্যন্ত কম। উক্ত ধরনের সুবিধা দিয়ে কোন অবস্থাতেই উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের প্রকৃত পুনর্বাসন সম্ভব হতে পারে না। উক্ত প্রস্তাবিত প্যাকেজ সুবিধা জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক টাস্ক ফোর্সের দ্বিতীয় সভায় পেশকৃত প্রস্তাবিত সুযোগ-সুবিধাদি হতে অনেক কম। পেশকৃত উক্ত সুযোগ-সুবিধাদি হলো-

(ক) বাস্তুভিটাসহ জমিজমা ফেরৎ প্রদান করা;

(খ) ঘরবাড়ী নির্মাণ, ঢেউটিন ও অন্যান্য সামগ্রীসহ নগদ ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা;

(গ) এককালীন অর্থ সাহায্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করা;

(ঘ) এক বৎসরের রেশনসহ তেল, ডাল ও লবণ প্রদান করা;

(ঙ) ভূমিহীনদের ভূমি প্রদান করা;

(চ) পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা;

(জ) চাকুরীতে পুনর্বহাল করা ও জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা;

(ঝ) হেডম্যানদের পুনর্বহাল করা;

(ঞ) ঋণ মওকুফ করা;

(ট) মামলা প্রত্যাহার করা।

বিগত খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ সমীরণ দেওয়ানকে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠিত হওয়ার পর এ যাবৎ ২০০৪ সালের ২২ এপ্রিল, ২৭ মে, ২৫ জুলাই এবং ২১ নভেম্বর এই চার বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বিষয়ে মৌলিক কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পূর্ববর্তী টাস্ক ফোর্সের সূত্র ধরে পূর্বের মতোই সরকার পক্ষ সেটেলার বাঙালিদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার পক্ষের এই প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান টাস্ক ফোর্সও পূর্বের মতো অচল হয়ে পড়েছে। ফলতঃ আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গত ৩ জুন ২০০৭ খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার পর পরই টাস্ক ফোর্সের সদস্য ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধি সন্তোষিত চাকমা বকুলকে সার্কিট হাউসের সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২৩ মার্চ ২০০৯ খাগড়াছড়ি আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠিত হয়। টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠনের পর গত ৫ অক্টোবর ২০০৯ ও ২৭ জানুয়ারী ২০১০ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে এবং ২৬ জানুয়ারি ২০১১ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে টাস্ক ফোর্সের তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভাগুলোতে মূলত: আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিচিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও প্রকৃত আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের অন্তর্ভুক্ত করা, ২০-দফা প্যাকেজ সুবিধা, টাস্ক ফোর্সের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত করা, টাস্ক ফোর্সের মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং জনবল ও তহবিল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক সেটেলার বাঙালিদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করলে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও টাস্কফোর্সের সদস্য মো: শফি এর বিরোধিতা করেন। এ সময় টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান মহোদয় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির নিকট পেশ করার অভিমত ব্যক্ত করেন। অপরদিকে সরকারী কর্মকর্তারা টাস্কফোর্সের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রস্তাব করলে জনসংহতি সমিতি ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীর প্রতিনিধিদ্বয় এর বিরোধিতা করেন।

ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান সংক্রান্ত

এই খন্ডের ৩নং ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক ভূমিহীন বা দু' একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দু' একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান থাকলেও সরকার পক্ষ হতে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। বরঞ্চ ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের নামে চুক্তি লঙ্ঘন করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তিন পার্বত্য জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি

এই খন্ডের ৪নং ধারায় বলা আছে যে, জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।

এই ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, এই ধারা অনুযায়ী ৩ জুন ১৯৯৯ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে ল্যান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কার্যভার গ্রহণের আগে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ৫ এপ্রিল ২০০০ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আব্দুল করিমকে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১২ জুন ২০০০ কার্যভার গ্রহণ করেন। কার্যভার গ্রহণের পর তিনি একবার মাত্র খাগড়াছড়ি জেলায় সফর করেন। তারপর তিনিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর প্রায় দেড় বছর ধরে চেয়ারম্যান পদ শূণ্য থাকে। পরে বিগত জোট সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে ২৯ নভেম্বর ২০০১ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাহমুদুর রহমানকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। তিনিও গত নভেম্বর ২০০৭ সালে মারা যান। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে দাবী করা হলেও ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেনি।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা ব্যতিরেকে ১৯ জুলাই ২০০৯ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৮ জুলাই ২০১২ তাঁর মেয়াদ শেষ হলেও এখনো পর্যন্ত কাউকে কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ লাভের পর ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় গত ২৭ জানুয়ারি ২০১০ মাত্র একবার আনুষ্ঠানিক সভা আহ্বান করার পর আর কোন পূর্ণাঙ্গ আনুষ্ঠানিক সভা আহ্বান করেননি। পক্ষান্তরে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় সফর করে কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই ভূমি জরিপের ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য যে, তিনি প্রথমে গত ৩-৫ আগস্ট ২০০৯ তিন পার্বত্য জেলা সফর করেন এবং বিধিবহির্ভূতভাবে জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে চিঠি প্রেরণ করে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সফরকালে কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই একতরফাভাবে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপের ঘোষণা দেন। এরপরে ৭-৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তিনি আবারও যথাক্রমে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি সফর করেন এবং খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসককে কমিশনের সচিব হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁর মাধ্যমে একদিনের নোটিসে আহুত যৌথ সভায় তিনি মতবিনিময় করেন। ভূমি কমিশনের কোন আনুষ্ঠানিক সভার আয়োজন না করে কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ভূমি জরিপের পন্থা-পদ্ধতি ঠিক করা হবে এবং ১৫ অক্টোবর ২০০৯ থেকে শুরু করে আগামী বছরের ১৫ মার্চ ২০১০ এর মধ্যে ভূমি জরিপ সম্পন্ন করা হবে বলে তিনি ঘোষণা দেন।

আরো উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির 'ঘ' খন্ডের ২নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে- "সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।"

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক আগে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না করে এবং আভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের তাদের জমি প্রত্যর্পন না করে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি ও ভূমি মালিকানা চুড়ান্তকরণের মাধ্যমে পাহাড়ি জনগণের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত না করে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের একতরফাভাবে ভূমি জরিপ ঘোষণার বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের অনেক সংগঠন তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের এই ঘোষণাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও পদ্ধতি-বহির্ভূত বলে এসব সংগঠন দাবী করে।

তা সত্ত্বেও ভূমি কমিশনের কোন সিদ্ধান্ত ছাড়া ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের নির্দেশে ভূমি কমিশনের সচিব ২০১০ সালের জুলাই মাসে ভূমি জরিপের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নোটিস জারী করে। অন্যথায় উক্ত মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হবে বলে নোটিসে উল্লেখ করা হয়।

ভূমি কমিশন চেয়ারম্যানের এরূপ একতরফা ও বিধি-বহির্ভূত কার্যকলাপের কারণে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ সালে খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটির সভায় ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন না করা পর্যন্ত ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক একতরফাভাবে ঘোষিত বিচারিক কার্যক্রমসহ কমিশনের সকল কার্যক্রম স্থগিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান গত ৩ অক্টোবর ২০১১ খাগড়াছড়িতে ভূমি কমিশনের সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ব্যতীত কেউ অংশগ্রহণ করেননি। উক্ত সভা শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ভূমি জরিপ প্রয়োজন বলে আবারো উল্লেখ করেন। অন্যদিকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান গত ২৩, ২৪ ও ২৫ অক্টোবর ২০১১ যথাক্রমে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, সার্কেল চীফ, পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করেন। অবশ্য উক্ত সভায় আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও সার্কেল চীফগণ অংশগ্রহণ করেননি।

অপরদিকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যানের তদ্বিরের প্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর কার্যালয় কর্তৃক গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ মুঞ্জুর মোর্শেদ ভূঁইয়া নামে খাগড়াছড়ি জেলার জনৈক আইনজীবীকে ভূমি কমিশনের জিপি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। উক্ত মুঞ্জুর মোর্শেদ ভূঁইয়া খাগড়াছড়ি জেলা বিএনপি (জেলা কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক) ও সমঅধিকার আন্দোলন নামে উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে তিন পার্বত্য জেলা প্রবল প্রতিবাদ উঠে। প্রবল আপত্তির মুখে অবশেষে মুঞ্জুর মোর্শেদ ভূঁইয়াকে অপসারণ করে আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর কার্যালয় ১ জুন ২০১১ আইনজীবী আশুতোষ চাকমাকে কমিশনের জিপি হিসেবে নিয়োগ দেয়।

খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী সর্বশেষ চেষ্টা চালান ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একতরফা ও অবৈধভাবে শুনানী শুরু করার। খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী একতরফা ভূমি বিরোধ শুনানীর প্রথম প্রচেষ্টা চালান গত ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২। উক্ত শুনানীতে কমিশনের চেয়ারম্যান ছাড়া কমিশনের সদস্যের মধ্যে মাত্র চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর ৭(৩) ধারা অনুসারে "কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর দুই সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে"। তাই কোরাম সংকটের কারণে কমিশনের চেয়ারম্যানের একতরফা শুনানী অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর তিনি ১-২ এপ্রিল আরো দু'দিন শুনানীর সময় বর্ধিত করেন। বর্ধিত সময়েও একইভাবে কোরাম সংকটের কারণে ব্যর্থ হয়। খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর একতরফা শুনানীর দ্বিতীয় বার চেষ্টা চালান ২-৩ মে ২০১২। সেই বৈঠকে কমিশনের সদস্যের মধ্যে মাত্র চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ব্যতীত কোন সদস্য উপস্থিত না থাকায় কোরাম সংকটের কারণে তিনি তথাকথিত 'ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শুনানি'র মুলতুবি ঘোষণা করতে বাধ্য হন। কমিশনের অপরাপর সদস্যদের প্রবল আপত্তি ও আপামর জনগণের সর্বাত্মক বিরোধিতার মুখেও এভাবে গত ২৩-২৪ মে ২০১২ তৃতীয়বার তাঁর একতরফা ভূমি বিরোধ মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত করার এবং সর্বশেষ গত ১০-১১ জুন ২০১২ চতুর্থবার শুনানী অনুষ্ঠিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। ১০ জুন ২০১২ মঞ্চস্থ করা সর্বশেষ শুনানীতে একতরফা ও অবৈধভাবে তিনি ৪৮টি মামলার যাচাইবাছাই করে ১৭টি মামলা খারিজ করে দেন এবং অবশিষ্ট ৩১টি মামলার শুনানীর দিন আগামী ২৩ জুলাই নির্ধারণ করেন। অপরদিকে ১১ জুন আবার যাচাইবাছাই করে ৩২টি মামলার শুনানীও ২৩ জুলাই ২০১২ অনুষ্ঠিত করার ঘোষণা দেন। কিন্তু ১৯ জুলাই ২০১২ তাঁর মেয়াদ শেষ যাওয়ার পর তিনি আর সেই একতরফা ও অবৈধ কাজ করার সুযোগ পাননি।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। প্রয়োজনীয় জনবল ও পরিসম্পদ সম্বলিত কমিশনের কার্যালয় স্থাপিত হয়নি। ২০০৬ সালে কমিশনের কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও তা পরবর্তীতে বাতিল করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পরিসম্পদ বরাদ্দ এবং কমিশনের জন্য কার্যালয় স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয় এখনো অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, অতি সম্প্রতি স্মারক নং ভূঃম/শা-৪/স্থাঃমঃসিঃবাঃ(বিবিধ-০৯/২০১১-৮০২, তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ মূলে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞার স্বাক্ষরে তিন পার্বত্য জেলার ভূমিহীনদের তালিকা প্রণয়ন প্রস্তুত করত: জরুরী ভিত্তিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারদের নির্দেশ দেয়া হয় এবং উক্ত নির্দেশনার আলোকে তিন পার্বত্য জেলার উপজেলা ভূমি অফিস থেকে সকল মৌজা হেডম্যানদেরকে ভূমিহীনদের তালিকা প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অগোচরে ভূমিহীনদের তালিকা প্রণয়নের সরকারী উদ্যোগের ফলে তিন পার্বত্য জেলার নানা সন্দেহ ও ক্ষোভের উদ্রেক করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আশু জরুরী বিষয় হচ্ছে ২০০১ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করা। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। উক্ত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টি বিষয় রয়েছে।

উক্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। উক্ত সুপারিশমালা বিবেচনার্থে বিএনপি নেতৃত্বাধীন তৎকালীন জোট সরকারের আমলে ১২ মার্চ ২০০২ তৎকালীন আইন মন্ত্রী মওদুদ আহমদের সাথে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বাধীন পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ মোতাবেক ভূমি কমিশন আইনের সংশোধন করার ঐকমত্য হয়। তদনুসারে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভেটিং হয়ে যাবার পর উক্ত ভূমি কমিশন আইন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। এরপর আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এ বিষয়ে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি।

বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উক্ত বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য গত ৭ মে ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে সরকারের নিকট পুনরায় সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয়। উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবের উপর বিভিন্ন স্তরে একের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু এখনো ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো প্রথমে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় রয়েছে।

এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে যৌথভাবে যাচাইবাছাই পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করে বিল আকারে মন্ত্রী সভা ও জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য গত ২০ জুন ২০১১ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কাছে পাঠানো হলে ২২ জানুয়ারি ২০১২ ও ২৮ মে ২০১২ অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম সভায়ও উক্ত ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, উপরোক্ত প্রত্যেক সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সংশ্লিষ্ট সভার পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে আইনটি সংশোধনের জন্য সংসদে উত্থাপন করা হবে। কিন্তু এখনো উক্ত আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধনার্থে সংসদে বিল উত্থাপিত হয়নি। বর্তমানে ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে।

৩০ জুলাই ২০১২ আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় চূড়ান্তভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাবাবলী

ক্র:	সংশোধনীয় ধারাসমূহ	আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত
১।	প্রস্তাবনার ৩য় প্যারা : ***"পার্বত্য জেলা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য জনসংহতি সমিতি*** বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে;"	প্রস্তাবনার ৩য় দফা : ***"পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি*** বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে;
২।	ধারা ৩(২)(ঘ): "সংশ্লিষ্ট ***সার্কেল চীফ***, পদাধিকার বলে;"	ধারা ৩(১)(ঘ): "সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ ***বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি***;"
৩।	ধারা ৬(১)(ক): ***"পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি*** সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের ***প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী*** নিষ্পত্তি করা।"	ধারা ৬(১)(ক): "পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও ***অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হওয়া জায়গাজমি*** ও পাহাড়ের মালিকানাস্বত্ব বাতিলকরণসহ সমস্ত ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের ***প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী*** নিষ্পত্তি করা।"
৪।	ধারা ৬(১)(খ): "আবেদনে উল্লেখিত ভূমিতে আবেদনকারী, বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের, স্বত্ব বা অন্যবিধ অধিকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ***প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী*** নির্ধারণ এবং দখল পুনর্বহাল;"	ধারা ৬(১)(খ): "পার্বত্য চট্টগ্রামের ***প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী"*** শব্দাবলীর স্থলে "পার্বত্য চট্টগ্রামের ***প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি*** অনুযায়ী" শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা।
৫।	ধারা ৬(১)(গ): "পার্বত্য চট্টগ্রামে ***প্রচলিত আইন*** বর্হিভূতভাবে কোন ***বন্দোবস্ত প্রদান করা*** হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল:।"	ধারা ৬(১)(গ): "পার্বত্য চট্টগ্রামের ***প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি*** বহির্ভূতভাবে ***ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি)সহ*** কোন ভূমি ***বন্দোবস্ত প্রদান বা বেদখল করা*** হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল;" শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা। এবং ধারা ৬(১)(গ)এর শর্তাংশ "তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না।" শব্দাবলী বিলুপ্ত করা।

ক্র:	সংশোধনীয় ধারাসমূহ	আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত
৬।	ধারা ৭(৩): "কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং চেয়ারম্যান কমিশনের সকল বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন।"	ধারা ৭(৩): "কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর তিনজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং চেয়ারম্যান কমিশনের সকল বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন।"
৭।	ধারা ৭(৪): "কোন বৈঠকে বিবেচিত বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা পরবর্তী যে কোন বৈঠকে বিবেচনা ও ***নিষ্পত্তি করা যাইবে*** এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের কাহারও অনুপস্থিতির কারণে বিষয়টির নিষ্পত্তি বন্ধ থাকিবে না বা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।"	ধারা ৭(৪): "কোন বৈঠকে বিবেচিত বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা পরবর্তী যে কোন বৈঠকে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবে, তবে এইরূপ বিবেচনা ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ***কমিশনের সকল সদস্যকে নোটিস প্রদান করিতে হইবে*** এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের কাহারও অনুপস্থিতির কারণে বিষয়টির নিষ্পত্তি বন্ধ থাকিবে না বা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।"
৮।	ধারা ৭(৫): "চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ৬(১)-এ বর্ণিত বিষয়টিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে ***চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই*** কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"	ধারা ৭(৫): "চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ৬(১)-এ বর্ণিত বিষয়টিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে ***চেয়ারম্যানসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের গৃহীত সিদ্ধান্তই*** কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;"
৯।	ধারা ৯ : কমিশনের আবেদন দাখিল।	ধারা ৯ : কমিশনের ***নিকট*** আবেদন দাখিল।
১০।	ধারা ১০ : নতুন উপ-ধারা (৪) সংযোজন করা।	১০(৩) ধারার পরে নতুন উপধারা সংযোজন: "(৪) কমিশন কর্তৃক আবেদন নিষ্পত্তির পূর্বে যে কোন সময়, ন্যায় বিচারের স্বার্থে, আবেদনকারী তাঁহার ***আবেদন সংশোধন*** করিতে পারিবেন।"
১১।	ধারা ১৩ : নতুন উপ-ধারা (৩) সংযোজন করা।	১৩(২) ধারার পরে নতুন উপ-ধারা সংযোজন : "(৩) এই ধারার অধীন কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ***পার্বত্য জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ*** প্রদান করা হইবে।"
১২।	***ধারা ১৮: "বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-*** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ***সরকার,*** এই আইন বলবৎ হইবার ***ছয় মাসের মধ্যে,*** সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিবে।"	***ধারা ১৮: "বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের*** উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ***সরকার,*** এই আইন বলবৎ হইবার পর ***যথাশীঘ্র*** সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিবে।"
১৩।	নতুন ধারা ২১ সংযোজন করা।	***"২১। কমিশনের কার্যাবলী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্তকরণ।-*** কমিশন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী ***পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত হইবে*** এবং এই আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্যকর হইবে।

ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার বিষয়টি এখনো চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বিরাজ করছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় ভূমি বিরোধ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হচ্ছে এবং সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখলের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

রাবার চাষ ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ

এই খন্ডের ৮নং ধারা মোতাবেক যে সকল অউপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা লীজ পাওয়ার পর দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি বা জমি সঠিক ব্যবহার করেননি সে সকল জমির ইজারা বাতিল করার বিধান থাকলেও আজ অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি সংরক্ষণ আন্দোলনের মতে আশি ও নব্বই দশকে বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সমতল জেলার অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১,৮৭৭ প্লটের বিপরীতে প্রায় ৪৬,৭৫০ একর জমি ইজারা দেয়া হয়েছে। এসব বরাদ্দকৃত একটি প্লটও আজ অবধি বাতিল করা হয়নি। পক্ষান্তরে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বিশেষতঃ বান্দরবান জেলায় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন করে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

গত ২০ জুলাই ও ১৮ আগস্ট ২০০৯ যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বান্দরবান জেলায় অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ইজারার মধ্যে যে সমস্ত ভূমিতে এখনো চুক্তি মোতাবেক কোন রাবার বাগান ও উদ্যান চাষ করা হয়নি সেসমস্ত ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বান্দরবান জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মৌজার হেডম্যান, জেলা কানুনগো, উপজেলার আমিন সমন্বয়ে বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় যেসব লীজ গ্রহীতাগণ বাগান সৃজন করে নাই তাদের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তক্রমে প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বাগান সৃজিত না করে চুক্তি পত্রের শর্ত লঙ্ঘিত করার কারণে ৫৯৩টি প্লট বাতিল করা হয় এবং লীজ বাতিলকৃত প্লট মালিকদের নিকট জেলা প্রশাসকের (রাজস্ব শাখা) কার্যালয় এর স্মারক নং-জেপ্রবান/লীজ-১০৬০/ডি/৮০-৮১/২০০৯ তারিখ ২৯/০৯/২০০৯ রেভেন্যু ডেপুটি কালেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) পক্ষে, জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটিস প্রদান করে আলোচ্য ভূমি সরকারের দখলে আনা হয়।

কিন্তু অত্যন্ত দু:খজনক ও উদ্বেগজনক যে, বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসন দুর্নীতির মাধ্যমে লীজ বাতিলের দু' মাসের মাথায় স্বারক নং- জেপ্রবান/লীজ মো:নং-১০৬০(ডি)/৮০-৮১/২০০৯ তারিখ ১৯/১১/২০০৯ মূলে বাতিলকৃত প্লটগুলোর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ প্লট পুনরায় বহাল করা হয়। অন্যদিকে অবশিষ্ট প্লট কাগজে কলমে বাতিল করা হলেও এখনো উক্ত ভূমি প্লট মালিকদের দখলে রয়েছে। পক্ষান্তরে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া, ভূমি কমিশন আইন সংশোধন না হওয়া, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া এবং পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী লীজ বাতিল না হওয়ার কারণে অস্থানীয় ও বহিরাগত বাঙালিরা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ও যোগসাজসে ইজারা ভূমির নামে হাজার হাজার একর ভূমি জবরদখল করে চলেছে এবং উক্ত জায়গা-জমি থেকে জুম্মদের চলে যেতে হুমকি দিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু এলাকায় ভাড়াটিয়া বহিরাগত বাঙালি শ্রমিকদের লেলিয়ে দিয়ে জুম্ম গ্রামবাসীর উপর হামলাও চালিয়েছে। ফলত: আদিবাসী জুম্মরা শংকিত ও উদ্বিগ্নাবস্থায় জীবন যাপন করছে। অতিশীঘ্রই ইজারা বাতিল না হলে এবং দখলদারদের উচ্ছেদ করা না হলে এতদাঞ্চলের পরিস্থিতি চরম সংকটের দিকে যাবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ

এই খন্ডের ৯নং ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা ও এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করা এবং এই অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগানোর বিধান থাকলেও সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণে ও যথাযথ পদ্ধতিতে অর্থায়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান

এই খন্ডের ১০নং ধারা মোতাবেক চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা, উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করার বিধান রয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ রয়েছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (বিসিএস) পাহাড়িদের কোটা সংরক্ষিত থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকারী কোন বৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অধিকন্তু ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উপজাতীয় কোটা'কে 'পার্বত্য কোটা' হিসেবে রূপান্তরিত করে সেটেলার বাঙালিদেরও উক্ত কোটায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের নিকট তিন পার্বত্য জেলার সরকারী ও বেসরকারী প্রাইমারী, মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষকদের আবাসন ও পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান কলেজে অধিকসংখ্যক বিষয়ে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালুকরণসহ শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করারও দাবী জানানো হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে একতরফাভাবে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখার দাবী জানিয়েছে পার্বত্যবাসী।

উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

এই খন্ডের ১১নং ধারা মোতাবেক আদিবাসী জুম্মদের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা বজায় ও বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মন্ত্রী-ভিআইপিদের নাচ-গান পরিবেশন করা এবং কিছু সংকলন প্রকাশ করার মধ্যেই সীমিত রয়েছে। পক্ষান্তরে জুম্মদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির পূর্বেকার ধারা অব্যাহত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের আদিবাসী নাম পরিবর্তন করে বাঙালি বা ইসলামীকরণ অব্যাহত রয়েছে। পাঠ্য-পুস্তকে ইসলামী ধারার শিক্ষা গ্রহণে জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হচ্ছে। পক্ষান্তরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ্য-পুস্তকে যথাযথভাবে উল্লেখ নেই; যা উল্লেখ করা হয়েছে তা অত্যন্ত বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া জুম্মদেরকে ইসলামী কায়দায় 'জনাব' লিখতে বা সম্বোধন করতে বাধ্য করা হয়।

জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান

এই খন্ডের ১৩নং ধারা মোতাবেক সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পালনীয় সব কিছু যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার

এই খন্ডের ১৪নং ধারায় নির্ধারিত তারিখে জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার কর্তৃক তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা এবং যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করার বিধান রয়েছে। ১৬নং ধারায় জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা ও জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারী অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করার বিধান রয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ৬ দফায় ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৮৩৯টি মামলার তালিকা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। তন্মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে তিন পার্বত্য জেলায় গঠিত মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত তিনটি জেলা কমিটি কর্তৃক যাচাইবাছাই করে ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে আজ অবধি উক্ত সুপারিশ অনুসারে উক্ত মামলাগুলো প্রত্যাহারের গেজেট জারী হয়নি। এছাড়া এখনো ১১৯টি মামলা অপ্রত্যাহারের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। অধিকন্তু সামরিক আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। সাজাপ্রাপ্ত মামলাসমূহের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমার আবেদন করেছেন। কিন্তু উক্ত আবেদনগুলো বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আটকে রয়েছে। মামলা প্রত্যাহারের খতিয়ান নিম্নে দেয়া গেল–

জেলা	মোট মামলা	প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত	অপ্রত্যাহৃত মামলা
রাঙ্গামাটি	৩৫০	২৮৫	৬৫*
খাগড়াছড়ি	৪৫১	৪০৫	৪৬
বান্দরবান	৩৮	৩০	৮
মোট	৮৩৯	৭২০	১১৯

*সাজাপ্রাপ্ত ৪৩টি মামলাসহ

জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকুরীতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন

এই খন্ডের ১৪নং ধারায় জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা, প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাদের পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা, জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা এবং এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করার বিধান রয়েছে।

পূর্বে চাকুরীতে ছিলেন ৭৮ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যের মধ্যে ৬৪ জনকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের নিকট বার বার আবেদন সত্ত্বেও তাদের অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি অদ্যাবধি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরদিকে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনের জুন-জুলাই মাসে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প এখনো সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে। পক্ষান্তরে সরকার জনসংহতি সমিতির ৪ জন সদস্যের মোট ২২,৭৮৩ টাকার ঋণ মওকুফের আবেদন করা হলেও উক্ত ঋণ মওকুফ করা হয়নি।

সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার

এই খন্ডের ১৭নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে 'আঞ্চলিক পরিষদ' যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারবে।

এই চুক্তির স্বাক্ষরের পর প্রথমে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের চিঠি জনসংহতি সমিতির নিকট হস্তগত হয়েছে। পক্ষান্তরে সরকার প্রচার করছে যে, এযাবৎ দুই শতাধিক ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কোন ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে তার তালিকা সম্বলিত কোন চিঠিপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়নি। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার গঠিত হওয়ার পর একটি ব্রিগেডসহ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এসব ক্যাম্পের কোন তালিকা (কাগজপত্র) জনসংহতি সমিতির নিকট পাঠানো হয়নি। এছাড়া প্রত্যাহৃত ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে লংগদু উপজেলায় ২টি, বরকল উপজেলায় ২টি ও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় ১টি ক্যাম্প পুনর্বহাল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংঘাতকালীন সময়ে জারীকৃত সেনাশাসন এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ প্রশাসনে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রয়েছে। 'অপারেশন দাবানল' এর পরিবর্তে ১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' জারী করে একপ্রকার সেনাশাসন অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এই ধারার (খ) উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু চুক্তির এই ধারা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের জায়গা মূল মালিক বা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। উপরন্তু ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল করা হচ্ছে। যেমন-

১।	বিলাইছড়ি ক্যাম্প থেকে এপিবিএন সদস্যদের প্রত্যাহার করে সেনা সদস্য মোতায়েন (১৭ অক্টোবর ২০০৩); এ সময় উপজেলার সাক্রাছড়ি ক্যাম্প ও গাছকাবাছড়া ক্যাম্পেও এপিবিএন সদস্যদের প্রত্যাহার করে সেনা সদস্য মোতায়েন
২।	রুমা সেনাবাহিনী গ্যারিসন স্থাপনের জন্য ৯,৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ
৩।	বান্দরবান সদর ব্রিগেড সম্প্রসারণের নামে ১৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ

৪।	বান্দরবানে আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে ৩০,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ
৫।	বান্দরবানে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২৬,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ
৬।	লংগদু জোন সম্প্রসারণের জন্য ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ
৭।	পানছড়ি জোন সম্প্রসারণের জন্য ১৪৩ একর জমি অধিগ্রহণ
৮।	মাটিরাঙ্গা উপজেলায় গোকুলসমমণি কার্বারী পাড়ায় সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন
৯।	কাউখালী উপজেলার ঘাগড়ায় ঘিলাছড়ি মুখ তালুকদার পাড়ার প্রীতি বিকাশ তালুকদার ও সাধন বিকাশ চাকমার ভূমি জবরদখল করে ক্যাম্প স্থাপন (১৬ জুন ২০০৩)
১০।	মানিকছড়ি উপজেলার ২নং বাটনাতলী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে বান্যাছোলা নামক সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন (২০০৪)
১১।	লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার লক্ষ্মীছড়ি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে বান্যাছোলা নামক স্থানে সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন (২০০৪)
১২।	কাউখালী উপজেলাধীন খিয়াম এলাকায় সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন
১৩।	রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাসা ইউনিয়নের বেতছড়া নামক স্থানে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন (জানুয়ারি ২০০৫)
১৪।	রাজস্থলী উপজেলার বাঙালহালিয়া বাজারে নতুন ক্যাম্প স্থাপন (২০০৫)
১৫।	খাগড়াছড়ি জেলার দাঁতকুপ্যা গ্রামে নতুন ক্যাম্প স্থাপন (মার্চ ২০০৭)

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাহ্যতঃ সিভিল প্রশাসন বলবৎ থাকলেও অপারেশন উত্তরণের বদৌলতে কার্যতঃ সেনাবাহিনীই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাস্তাঘাটে চেক পোস্ট বসিয়ে সেনাবাহিনী পূর্বের মতো যাত্রীবাহী বাস লঞ্চ থেকে শুরু করে সকল প্রকার যানবাহন তল্লাসীসহ গ্রামাঞ্চলে অপারেশন অব্যাহত রেখেছে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতেই সেটেলার বাঙালি জুম্মদের উপর একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

সকল প্রকার চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ

এই খন্ডের ১৮নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে প্রস্তাব করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় এখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং বাস্তবক্ষেত্রেও অদ্যাবধি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকুরীতে বহিরাগতরা (অস্থায়ী বাসিন্দা) নিয়োগ লাভ করে চলেছে এবং এসব নিয়োগের প্রক্রিয়ায় চরম দুর্নীতি ও ক্ষমতাসীন দলের দলীয়করণ অব্যাহত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এই খন্ডের ১৯নং ধারায় বর্ণিত উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করার বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৫ জুলাই ১৯৯৮ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতার তালিকা সম্বলিত Rules of Business-এর প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এই ধারা মোতাবেক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।

বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে (২০০২-২০০৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য জুম্মদের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়নি। এই ধারা লঙ্ঘন করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রাখা হয়। পক্ষান্তরে উপজাতীয়দের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ না করে একজন উপমন্ত্রী নিয়োগ প্রদান করা হয়। অপরদিকে এই ধারা মোতাবেক এখনো উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়নি। এই ধারা মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন না করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কাজ মনিটরিং করা হয়।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে (২০০৭-২০০৮) প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অআদিবাসী উপদেষ্টার হাতে অর্পণ করা হয়। পরে ২০০৭ সালের নভেম্বরে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন প্রধান উপদেষ্টা একজন বিশেষ সহকারী নিয়োগ করে তাঁর হাতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভেব পর রাঙ্গামাটি আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয় এবং তাঁকে মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

Rules of Business অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইহার দায়িত্ব ও ক্ষমতা যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৯৯% জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নয়। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক বিষয়ে সংবেদনশীল নয়। ফলত: অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী অধিবাসী তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে লক্ষ্য করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।

ক) সাধারণ

১। উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে।

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	ঃ	আহ্বায়ক
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান	ঃ	সদস্য
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি	ঃ	সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১। পরিষদের বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে- "কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় হিসাবে কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যপদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" - এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভূক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সর্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।
তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পন" -- এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। ক) প্রথম তফসিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ
ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;
খ) পুলিশ (স্থানীয়);
গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;
ঘ) যুব কল্যাণ;
ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
চ) স্থানীয় পর্যটন;

ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;
জ) স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;
ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
ট) মহাজনী কারবার;
ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফশীলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ
ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি;
খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;
গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;
ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;
ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;
চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;
ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়েলটির অংশবিশেষ;
জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;
ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়েলটির অংশবিশেষ;
ঞ) ব্যবসার উপর কর;
ট) লটারীর উপর কর;
ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।
পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয়	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয়	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরুং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূণ্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

ঘ) আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দুর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নুতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;
গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;
ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;
চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;
ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;

ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার

ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারী অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী;
২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ;
৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ;
৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি;
৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি;
৮) সাংসদ, বান্দরবান;
৯) চাকমা রাজা;
১০) বোমাং রাজা;
১১) মং রাজা;
১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অউপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে	বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্)	***(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)***
আহ্বায়ক	সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Parbatya Chattagram Chukti Bastabayan Prasange-2 December 2012

published by Information and Publicity Department of Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) on 2 December 2012 from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.

Telefax: +880-351-61248, E-mail: pcjss.org@gmail.com, Web: www.pcjss-cht.org